

= নিষ্ঠা ধীরেচান্দের নব নির্বেশ =

মাতৃস্বত্ত্ব



চিত্র পরিবেশক :—
 অরোরা ফিল্ম কল্পনালয়।
 ১২৫ বং ধৰ্মতলা ট্রাই, কলিকাতা।

সংগঠনকারী

(কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাহিনী অবলম্বনে)

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| চির নাট্য পরিচালনা | ... দেবকী বহু |
| সুর-শিল্পী | ... রাই বড়াল |
| চির-শিল্পী | ... ইউসুফ মুলজী |
| শব্দ-ধর | ... অতুল চাটাজী |
| রসায়নগারিক | ... সুবেদর গাছপালী |
| চির সম্পাদক | ... কাগী রাহা |
| শিল্প পরিকল্পক | ... তারক বহু |
| গীতকার | কাজী নজরুল এবং অজয় ভট্টাচার্য |

প্রবর্দ্ধক : বাতীন মিত্র

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : ভোলানাথ মিত্র, অপূর্ব মিত্র, মনোজ ভজ্জ এবং জ্যোতি ভট্টাচার্য। চির-শিল্প : সুধীন মজুমদার, কেষ্ট মুখাজ্জী

শব্দ-ধারণায় : মনি বোস, শ্চিন দে এবং ক্ষেত্র ভট্টাচার্য।

ব্যবস্থাপনায় : শ্রাম লাহা এবং শৈলেন মার্মা।

| | |
|----------------|---------------------------|
| জহর | ... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য |
| বিশুন | ... রাতীন বন্দোপাধ্যায় |
| বুমুরো | ... পাহাড়ী সান্তাল |
| চন্দন | ... কানন দেবী |
| ঘটা-বড়ো | ... কৃষ্ণজ্ঞ দে |
| তেঁতুলে | ... শ্রাম লাহা |
| পুটে | ... অহি সান্তাল |
| ঝটু | ... সত্য মুখোপাধ্যায় |
| মৌচুমী | ... মেনকা দেবী |
| বড়ো সন্দীর | ... প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় |
| বিশুনের সহকারী | নরেশ বোস |

দিল-খোলার দল :

মনি বর্কন, ইন্দ্র বহু,

ইন্দিস বন্দোপাধ্যায়, বজবাসী, শরদেব রায়, আলাউদ্দিন সরকার, আগা আবী, রেমচান, বতনলাল, বজবলভ পাল এবং খণ্গেন পাঠক।

চির পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, কলিকাতা।

৫ কাহিনি ৫

সত্যজগতের রুময়ুক্ত জনপদ হইতে বহুবেশে, ভীষণ নির্জন দুর্গম অবশ্যের মধ্যে, সাপুত্রের দল তাহাদের ক্ষণহস্তী নীড় রচনা করে।

এমনই এক ভবঘৰে সাপুত্রদলের ওষ্ঠাদ সে। নাম তাহার জহর। দলের সে বিধাতা, একছত অধিপতি। দলের প্রত্যেকটা লোক তাহাকে ভয় করে যথের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটামাত্র লোক, তাহার এই অপ্রতিষ্ঠিত প্রভুর পৌরবে দীর্ঘায় জলিয়া পুড়িয়া মরে, তাহার নাম বিশুণ।

মনে-মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও-বা কেমন করিয়া জহরকে চুপ্ত করিয়া একদিন সে সর্দার হইয়া উঠিবে, সেই কঞ্জনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন নাগ পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষধর সর্পের সকানে। তাহার তুবড়ী বাশীতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া স্বর—একটা বিষধর কালীয় নাগ ফলা দুলাইতে দুলাইতে বাহির হইয়া আসিয়া মুহূর্তে একটা তীব্র দশ্মন করিল। দেখিতে দেখিতে জহরের সর্বশরীর সেই সাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। পরে সে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে-ধীরে শীঘ্ৰই বিজয়ী ধীরের মতো সৌরৱে বিষমুক্ত হইয়া উঠিল। বিষ্ণু বিশ্বিত জনতা, সমস্তের জয়বন্দি করিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া বিশুণ ধীরে-ধীরে নীরবে স্থেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই করিয়া আজ পর্যন্ত, জহর নিরানকই বার নিজের দেহে সর্পদংশন করাইয়া, অবশীলাক্ষে বিষমুক্ত হইয়াছে। এইবার শততম এবং শেষতম সর্পদংশন। এই সর্বশেষ সর্পের বিষ, মন্ত্রবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাহার কঠোর ব্রত উদ্যাপিত হইবে; সে সর্বমন্ত্রে পিঙ্কাকাম হইবে। এই মন্ত্রে সিক্ষ হওয়াই জহরের জীবনের পরমতম লক্ষ্য একমাত্র মহাব্রত।

এই সাধনার জন্য সে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবগতন করিয়াছে। আজীবন চিরকুমার ধাকিয়া, নিকামভাবে সম্পত্তিতে বৃত পালন করিয়া, ভবঘৰের মতো জহর তথ্য নানা দেশ-বিদেশে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে।

এমন সময় হটাই একদিন সে দেখিল, একটা ক্ষীণশোতা নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমামুন্দরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদংশনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। শ্বেতের জলে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহকালের প্রচাপিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুত্র জাতির স্বধৰ্ম রক্ষা করিতে গিয়া, সে নদীয় জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিতা করিল।

জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটোকে লইয়া সে কি করিবে? অন্তের নিঠির পরিহাস ছাড়া আর কি হইতে পারে! জহর তাহার সংস্কারবশে বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মাঝ্য করিবে। সে তাহাকে একরকম উগ্র ঔষধ পান করাইল, যাহাতে এই ঔষধের গুণে, তাহার মধ্যে নারী-স্তুলভ কোনো চেতনা জাগ্রত না হয়।

জহর তার নাম গাথিল চন্দন—তাহাকে সঙ্গে লইয়া জহর অন্ত এক সাপ্তদের দলে যোগদান করিয়া একত্র অধিষ্ঠিত হইয়া উঠিল। চন্দন যে বালক নয়, দলের কেহই সে কথা জানে না। জহরের এক প্রিয়তম শিশু ঝুমরো, তাহার একমাত্র প্রিয় সহচর। চন্দনকে ঝুমরো বড় ভাগবানে।

সেইদিন রাতে শ্রবণ করিতে যাইবার পূর্বে অকস্মাত এক তাও মধুর বেদনার মতো চন্দনের বৃক্ষের মধ্যে আসিয়া বিধিল এবং ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উয়াদ অঙ্গীর করিয়া তুলিল। প্রাণপন চিন্তসংযমের দ্বারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাহার এই সাময়িক মোহকে অতিক্রম করিল। উয়াদের মতো ছুটিয়া গিয়া সে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসাৰ পদপ্রাপ্তে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার আস্থানিব অভূতাপে অশ্রূমোচন করিল। দেবী প্রতিমার ক্ষতিক্ষণ্ঠ অস্তরের সকরণ প্রার্থনা জানাইয়া, সে প্রায়স্থিত করিল।

কিন্তু যে স্থুল কামনার আগুন একবার জলিয়াছে, এত সহজে কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে চাহিল না। ঠিক সেইদিন খবর পাওয়া গেল, বাজার সিপাহীয়া সাপুত্রের উপর বিষম অত্যাচার মুক্ত করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি ভয়ানক ছেলেচুরি হইতেছে। সকলের ধারণা সাপুত্রের এই কার্য করিতেছে।

এই খবর পাইবামাত্র, জহর সদস্যবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহ পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজন, ভীষণ খাপদসঙ্কুল এক অরণ্যের মাঝখানে তাহাদের তাঁবু ফেলিল। তাঁবুর চারিদিকে আগুন জাগিয়া তখন প্রচুর শৃঙ্খল করিতেছে। জহর, ঝুমরো, চন্দন, বিশুন, বিশুনের পুত্র তেঁতুলে নৌগ শৈমাখারী দলের যাতুকৰ গণকটাকুর ঘটাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্নালোকিত রাতে, মুঢ় আনন্দে এই অপূর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে। এমন সময় কি যেন একটা তুচ্ছ কারণে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সঙ্গে ঝুমরোর ভীষণ কলহ বাধিয়া গেল—চন্দন ছিল দূরে দাঢ়াইয়া, তেঁতুলে অকথ্য অপমান করিবে ঝুমরোকে এ তাহার অসম্ভ। সেও ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝখানে। কিন্তু টানাটানি অস্তরণস্থিতিতে হঠাৎ যেই মৃহর্তের জন্ম তাহার বক্ষাবরণ ছিন্ন হইয়া গেল, দলের সকলে বিষয়ে হত্যবক হইয়া দেখিল চন্দন পুরুষ নয়—ছন্দবেশে পরমামৃদুরী এক তরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে আর একটা হৃদয়ী তরুণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঢ়াইল। তাহার নাম মোটুলী। সে নিজের উন্নতীগঠ তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দনের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিশোর চন্দনকে সে কুমারী-হানয়ের নীরব প্রেমের পুষ্পাঙ্গি নিবেদন করিয়াছিল—আজ যথন দেখিল, চন্দন তাহারই মত এক তরুণী, তখন তাহার লজ্জাক্ষণ প্রগত-স্পন্দনের প্রাসাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল।

এদিকে নিচ্ছতে, তাঁবুর এককোণে, ধৰ্মৰ করিয়া কাপিতে কাপিতে জহর তীতা হরিয়ীর মত চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, “চন্দন, চন্দন, তুই আমাৰ—একমাৰ আমাৰ!”

চন্দন ঝুঁটাই নিজেকে প্রাণপনে তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যথন আৰ জহরকে প্রতিনিয়ুক্ত করিতে পারিল না, তখন কাতৰকষ্টে জহরকে প্রাণ করাইয়া দিল—তাহার মহাবৰ্তৱের কথা, তাহার জীবনের একমাত্র কায়ে নাগ মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা।

কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নির্মম মহাস্তোর মতো ধৰ্ক করিয়া বাজিল। সতাই ত'! এ কি করিতেছে সে! জহর যেন অক্ষয় তাহার সবিং কিয়িয়া পাইল। মনসা-দেবীৰ প্রতিমার পানে সে অস্তুত দৃষ্টিতে একবার তাকাইল তাহার পর কিসের যেন একটা অব্যক্ত মৰ্মসংগ্রাম কাতৰ হইয়া, তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আজই—এই রাতেই সে” তাহার শাততম সৰ্বাংশন পৰীক্ষায় উন্তৰ্ণ হইয়া, জীবনের মহাবৰ্ত উদ্ঘাপন করিবে। আৰ বিসম্ব নয়।

বিষধৰ সৰ্বে সক্ষান করিয়া, জহর যেননই তাহার কৰ্ম দিক্ষ করিতে যাইবে, অননই বিশুন কোথা হইতে ছুটতে ছুটতে আসিয়া সংবাদ দিল চন্দনকে লইয়া ঝুমরো পালাবন করিয়াছে।

ক্রোধে, উয়াদের মতো অৰী হইয়া, জহর ছুটিয়া চলিল চন্দন ও ঝুমরোর সঙ্গে। কিন্তু দলের দেহই তাহাকে তাহাদের সক্ষান দিতে পারিল না, তীব্র উত্তেজনায় সৰ্বশক্তিৰে তখন তাহার যেন আগুন ধৰিয়া গেছে।

উপাসনের মতো তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া, সে ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল, বিষধৰ কালিয়নাগ। সেই ভীষণ কালীয়নাগকে লইয়া সে ছুটির আসিয়া মহাকাল-মন্দিরে—তাহার পর সেই কালীয়নাগকে মন্ত্রপূত করিয়া ঝুমরোর উদ্দেশে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমরো ও চন্দন তখন গভীর আনন্দে রোমাক্ষিত হইয়া গান গাহিতে গাহিতে নিকদেশের পথে চলিয়াছে। দূরে বহুদূরে চলিয়া গিয়া, তাহারা দৃঢ়নে একটি মধুর স্মৃথের নৌড় রচনা করিয়া প্রয়ানন্দে প্রেম-মধুযামিনী স্বপন করিবে অনন্তকাল ধৰিয়া।

অপূর্ব আনন্দে বিতোর হইয়া, যথন তাহার! একেবারে আস্থাহাৰ হইয়া গেছে, তখন সহস্র বিমানেৰে বজ্পাতের মতো সেই মন্ত্রপূত কালীয়নাগ আসিয়া ঝুমরোকে দংশন করিয়া দিয়া, অদৃশ হইয়া গেল। বিষের বিষম যন্ত্ৰণায় অঙ্গীর হইয়া, ঝুমরো সেখানে বসিয়া পড়িল।

চন্দন একেবারে স্পষ্টিত নির্বাক! নিঃসহায়, নিরপায়ের মতো সে দাঢ়াইয়া রহিল। ঝুমরোকে বৰ্তাইতে হইলে, এখন তাহার আবাৰ সেই জহরের কাছে গিয়া দাঢ়ানো ছাড়া আৰ উপায় নাই।

অবিৱল অঞ্চলাবে চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না সে চলিয়াছে সেই পরিবৃত্ত তাঁবুর দিকে। কিন্তু কেমন করিয়া কোন ঘৰে সে আবাৰ জহরের কাছে গিয়া দাঢ়ানো ছাড়াইবে?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তরের মতো বসিয়া আছে। অঞ্মূলী চন্দন আসিয়া ডাইল তাহার কাছে। ঝানমথে মহুকম্পিত কঠে সে কহিল ঝুমরো তাহার

সাপুড়ে

প্রাণাপক্ষে প্রি। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেব তাহা হইলে ঝুমরোর
প্রাণের বিনিময়ে সে জহরের কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও প্রস্তুত। জহর একটি
কথাও বলিল না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে চঙ্গিল চন্দনের পিছু পিছু। নীরবে
সে গিরা দাঢ়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে প্রতিজ্ঞাবদ
— ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে সে আত্মবিক্রয় করিয়াছে জহরের কাছে। এখন
সে জহরের। ঝুমরোকে সে উভেজিত করণ, ভগ্নকষ্টে বলে, “তুই দূরে চলে যা
ঝুমরো। আমার চোখের স্মৃত্য ধাক্কিস নে— আমি তোর নই”।

অন্দের দাঢ়াইল, জহর এই করণ দৃশ্য দেখিতেছিল। যে কালীয়নাগ
মন্ত্রবলে ক্রিয়া আসিয়া ঝুমরোকে বিষমৃত করিয়াছে, সে তখনও তাহার
হাতে।

জহর একবার আত্মত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, একবার তাকাইল
ঝুমরোর দিকে— একবার মনে-মনে কি যেন ভাবিল।

অক্ষয়াৎ সে নির্বিকার ভাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুকে
পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ঝুমরো চিংকার করিয়া কহিল, “ওস্তাদ কি করলি !”

চন্দন ও ঝুমরো দুজনেই জহরের কাছে ছুটিয়া গেল: জহর ক্রস্কষ্টে
বলিয়া উঠিল, ‘ঝুমরো শীগাঁী’র একে নিয়ে চলে যা আমার স্মৃত্য
থেকে আমি বিষ হজম করবো, এই আমার শেষ সাপ— তারপর আমি মঞ্চ
পড়বো। মেঘেমাহবের সামনে মস্তর নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে নিয়ে
যা এ জঙ্গল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা”।

চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দুজনে
চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাগমন্ত্র আর সে উক্তারণ করিল না।

সুরিয়ের সপ্রে প্রেষ্ঠ মন্ত্র-সাধনার পরিনামে সে সিদ্ধকাম হইল কি ?



এক

হৃদয়-গান্ধার ফুল,

এনে দে, এনে দে নৈলে রাখব না, বাঁধব না চুল,

কুসুমী রং শাড়ী চুটি বেলোয়ারি

বাঙা পলাশ ফুল

কিনে দে হাট থেকে,

এনে দে মাঠ থেকে

বাবলা ফুল, আমের মুকুল।

নৈলে রাখব না, বাঁধব না চুল।

কুসুম পাহাড়ে, খাল-বনের ধারে

বস্বে মেলা আজি বিকাল বেলায়।

দলে দলে পথে চলে সকাল হতে

বেদে-বেদেনী নূপুর বৈধে পায়।

যেতে দে ও পথে বাঁশী শুনে শুনে পরাণ বাটল॥

নৈলে রাখব না বাঁধব না চুল॥

— কোরাস

— ছাই —

আকাশে হেলান দিয়ে

ঐ পাহাড়ের ঘরণা আমি ঘরে নাহি রই গো

উথাও হয়ে বই॥

চিতা বাষ মিতা আমার,

গোথো খেলার সাধী,

সাপের ঝাপি বুকে ধৰে'

স্বর্থে কটাই রাতি।

যুর্ণি হাওয়ার উড়নী ধরে নাচি তাঁথে ধৈ॥

— কানন —

— তিন —

কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো,

শঙ্গৰ সওদাগৰ

ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেটলা লক্ষিন্দৰ,

কলার মান্দাস।

ওলো কুল-বালা, নে এই পলার মালা,

বৰ তোর ভেড়া হয়ে রইবে মালাৰ ভয়ে

ও বো পাবি নে, জীবনে সতীন জালা॥

আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী।

গলার ঘ্যাগ পায়ের গোদ, পিডের ঝুঁজ;

বেৱ করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ;

ওথ জানিলো, হেঁকে প্রামিৰ

কোঁকা ধায় যে কামিনী॥

পেঁচী পাওয়া মিনয়ে গো

ভৃতে ধৰা বউ গো।

কালিয়া পেরেত মামদো ভৃত
 শাক-চুম্বী হামদো পুত
 পালিয়ে ষাবে, বেদের কবচ লও গো ॥
 বাঁশের কুলো, বেতের ঝাপি, পিয়াল পাতার টুকি ।
 নাও ওগো বৌ হবে খোকা খুকি ॥
 নাচ, নাচ, নাচ—বেদের নাচ ? সাপের নাচ ?
 সোলোমণী পাথর নেবে ? রঞ্জীন কাঁচ ?

কোরাম্

দেখি লো তোর হাত দেখি ।
 হাতে হলুদ-গুৰু এলি, রাধতে রাধতে কি ?
 মনের মতন বৰ পেলে নয় কষ্টা ছয় ছেলে ।
 চিকন আঙ্গুল নীঘল হাত, দালান-বাড়ী ঘৰে ভাত
 হাতে কাঁকল পায়ে বেড়ো ।
 ও বাবা ! এ কোন ছুড়ি ? সাত ননদ তিন খাণ্ড়ি ॥
 ডুবে ডুবে খাচ্ছ জল, কার সাথে তোর পিরীত বল ।
 চোখের জলে পারবি তারে বাঁধতে কি ?
 দেখি লো তোর হাত দেখি ।

কুফিজ দে

—চার—

- (কথা) কইবে না কথা কইবে না বৌ,
 তোর সাথে তার আড়ি - আড়ি - আড়ি ।
 (বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ী ॥
 বৌ কস্নে কথা কস্নে,
 এত অঞ্জে অধীর হ'স নে,
 ও নতুন ফুলের থবর পেলে
 পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
 ওর মন্দ স্বভাব ভারি ॥

— কানন



27-5-39

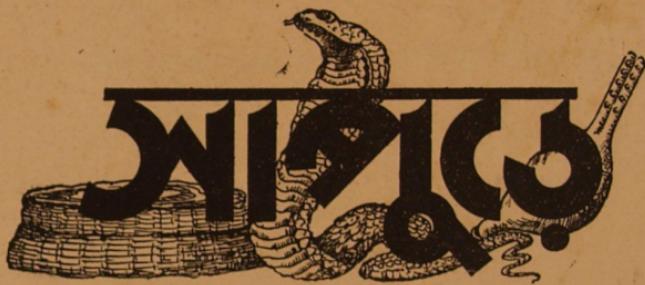
ନିଆଥୀଧୁଡ଼ାର୍ଜ ନବାନ୍ତବଦନ

ଆଶ୍ରମ



নিউ থিয়েটার্স'র

নব-নিবেদন



সংগঠনকারী

(কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাহিনী অবলম্বনে)

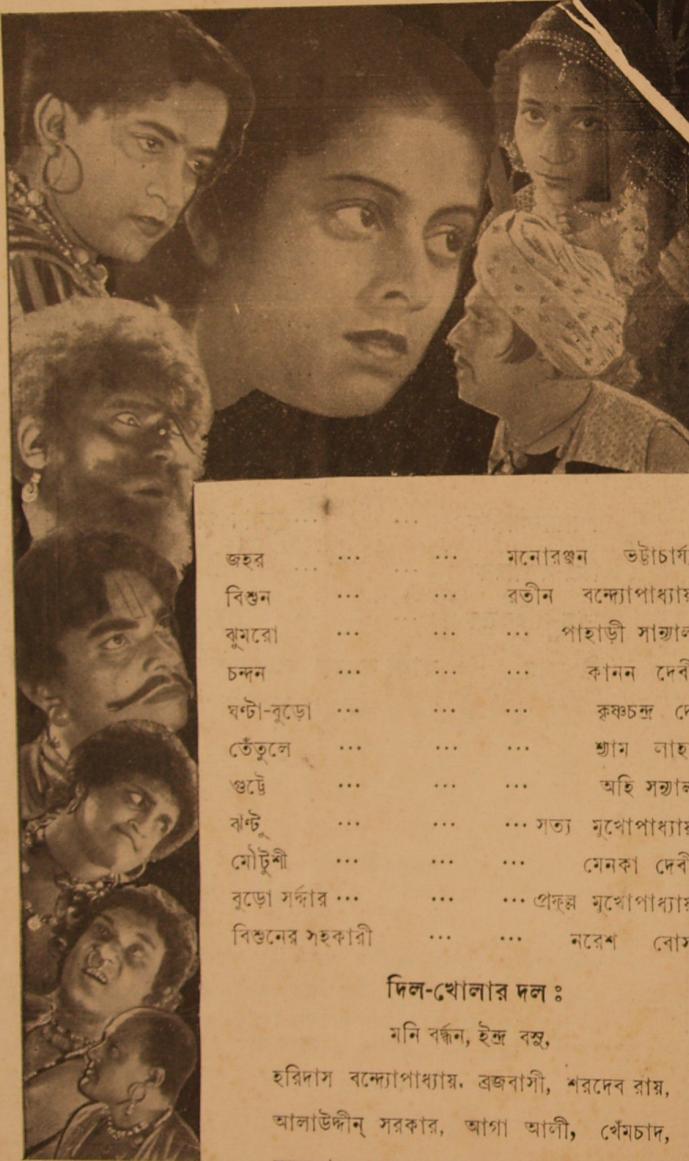
| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| চির-নাট্য ও পরিচালনা | ... দেবকী বসু |
| মুর-শিল্পী | ... রাষ্ট্র বড়াল |
| চির-শিল্পী | ... ইউসুফ মূলজী |
| শব্দ-ধর | ... আতুল চাটাঞ্জি |
| রসায়নগারিক | ... সুবোধ গান্ধুলি |
| চির-সম্পাদক | ... কালী রাহা |
| শিল্প-পরিকল্পক | ... তারক বসু |
| গীতকার | কাজী নজরুল এবং অভয় ভট্টাচাৰ্য |
| প্রবর্দ্ধকঃ যতীন শিশু | |

সহকারীগণঃ

পরিচালনায়ঃ তোদানাথ মিত্র, অপূর্ব মিত্র, মনোজ ভৱ্য
এবং জ্যোতি ভট্টাচার্য। চির-শিল্পী সুধীন মজুম-
দার, কেষু মুখাঞ্জী। শব্দ-ধারণায়ঃ মনি বোস,
শচিন দে এবং ক্ষেত্র ভট্টাচার্য।
ব্যবস্থাপনায়ঃ শাম লাহা এবং
শৈলেন মানা।

১৭২, দ্ব্যতলা ট্রাই, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুব্দীরেন্দ্র সাহ্যাল বৰ্তুক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ক্রামত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৮-১ডি রসায়নোড, কলিকাতা
সিটি গ্রাহিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।



| | | | |
|-----------------|-----|--------------------|------------------|
| জহর | ... | মনোরঞ্জন | ভট্টাচার্য |
| বিশ্বন | ... | রত্নীন | বন্দেয়োপাধ্যায় |
| বুমুরো | ... | পাহাড়ী সান্ত্বাল | |
| চন্দন | ... | কানন দেবী | |
| ষণ্টা-বুড়ো | ... | কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে | |
| তেঁতুলে | ... | শ্বাম লাহা | |
| গুট্টে | ... | অহি সন্তাল | |
| বাটু | ... | সত্য মুখোপাধ্যায় | |
| মোটুষ্ঠী | ... | মেনকা দেবী | |
| বুড়ো সর্দার | ... | গুকুল মুখোপাধ্যায় | |
| বিশ্বনের শহকারী | ... | নরেশ বোস | |

দিল-খোলার দল :

মনি বৰ্কিন, ইন্দ্ৰ বসু,

হরিদাস বন্দেয়োপাধ্যায়, অজনবাণী, শৰদেব রায়,
আলাউদ্দীন সরকার, আগা আলী, পেঁচাদ,
রত্নলাল, অজবলভ পাল এবং খণ্গেন পার্টক।



কাহিনী

যত্যজগতের সুসমৃক্ষ জনপদ হইতে
বহুদ্রে, কখনও ঘননীল শৈলমালার
সামুদ্রেশে, ভীষণ নিজস্ম হৃষ্ণম
বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে, যায়াবর সাপুড়ের দল তাহাদের ক্ষণছায়ী নীড় রচনা
করে।

এমনই এক ভবস্থুরে সাপুড়েদলের ওস্তাদ সে। নাম তাহার জহর।
দলের সে বিধাতা, একচৰ্ত্র অধিপতি। দলের গ্রট্যেকটি লোক তাহাকে
তয় করে যথের মতো, ভক্তি করে দেবতার মতো। শুধু দলের একটিমাত্ৰ
লোক, তাহার এই অগ্রত্বিহৃত প্ৰভু-পৌরুষে ঈৰ্ষায় জলিয়া পুড়িয়া মৰে,
মনে-মনে দারুণ অবজ্ঞা করে জহরকে, কিন্তু একাখণে তাহার বিৱৰ্কাচৰণ
কৰিবার সাহসও তাহার হয় না। এই লোকটির নাম বিশ্বন, তাহারও হই
একজন অমুচৰ আছে।

মনে-মনে সে মৃত্যু কামনা করে জহরের, কখনও-বা কেমন কৰিয়া
জহরকে চূৰ্ছ কৰিয়া একদিন সে সৰ্দীর হইয়া উঠিবে, সেই কল্পনায় চঞ্চল হইয়া
উঠে।

সাপুড়ে



সেদিন নাগ-পঞ্চমী।

জহর পাহাড়তলীতে গিয়াছিল বিষদর সর্পের সকামে। তাহার তুবড়ী বাশীতে, সে বাজাইতেছিল একটানা মোহনিয়া সুর—বাশীর রক্তে রক্তে, গমকে গমকে, তীব্র মধুর উয়াদনা কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল! সেই সুরে আঙুষ্ঠ হইয়া বনের ভিতর হইতে, একটি বিষদর কালীয় নাগ ফণ ঢুলাইতে ঢুলাইতে বাহির হইয়া আসিল। দারুণ উভেজনায়, জহরের চোখের তারা ছাইটি জলিয়া উঠিল। হঠাৎ হাতের বাশীটা সে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সেই কালীয় নাগের উক্তক ফণার স্মৃতে তাহার অক্ষিপ্ত করতল পাতিয়া ধরিল। মহুর্তে একটি তীব্র দংশন! দেখিতে দেখিতে জহরের শর্মীরীর সেই শাপের বিষে একেবারে নীল হইয়া গেল। দলের সমস্ত লোক সতরে, স্তুপ্তিবিশয়ে জহরকে ধিরিয়া দাঢ়াইল। জহর কিন্তু নিষ্কল্প, নির্বিকাৰ—উৰেগৱ চিহ্নমাত্রও তাহার মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। ধীরগস্তী-

কষ্টে, সে মুৰ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং ধীরে-ধীরে শীঘ্ৰই বাজীৰ বীৰের মতো সগৌরবে বিষমৃক্ত হইয়া উঠিল। বিমুক্ত, বিশ্বিত জনতা, সমস্তৱে জয়বন্দি কৰিয়া উঠিল। মুখ কালো কৰিয়া, বিশুন ধীরে ধীরে নীৱবে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

ঠিক এমনই কৰিয়া আজ পৰ্যন্ত, জহর নিৰানন্দইবাৰ নিজেৰ দেহে সৰ্পদংশন কৰাইয়া, অবলীগাঙ্গামে বিষমৃক্ত হইয়াছে। এইবাৰ শততম এবং শেষতম সৰ্পদংশন! এই সৰ্বশেষ সর্পের বিষ, মুৰবলে আপন দেহ হইতে টানিয়া বাহিৰ কৰিতে পাৰিলৈই, তাহাৰ কঠোৱ বৰত উদ্যাপিত হইবে; সে সৰ্পমুৰে শিক্ককাম হইবে। এই মন্ত্ৰে শিক্ক হওয়াই জহরেৰ জীবনেৰ পৰমতম লক্ষ্য, একমাত্ৰ মহাবৰ্ত।

এই সাধনাৰ জন্য সে কঠোৱ ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন কৰিয়াছে। আজীবন চিৱকুমার ধাকিয়া, নিকামতাবে শ্যথতচিতে বৰত পালন কৰিয়া চলিতেছে।



সাপুড়ে

জহরের অগণিত শুণ্যমুক্ত শিশু, যখন উদ্গীব হইয়া সেই শুভদিনের প্রতীক করিতেছে, এমন সময় শহসু দেদিন রাত্রে, তাহার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনার স্মৃতি হইল। পরিণামে এই ব্যাপারটি যে তাহার সাধনার ভিত্তিলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যাইবে, তাহা কি সে স্পন্দেও তাবিতে পারিয়াছিল?

তবং মতে জহর তখন নানা দেশ-বিদেশ যুরিয়া বেড়াইতেছে। নারীজাতির সংস্কর্ষ হইতে দূরে থাকিয়া থাকিয়া ক্রমশ জহরের মনে এই ধারণা বক্ষমূল হইয়া গিয়াছে যে, নারীজাতি সাধনার পথে সাংস্কৃতিক বিপ্লব স্ফুট করিয়া থাকে। ক্রমে নারীজাতির সম্মুখে অস্তরে সে বিজাতীয় বিত্তক্ষণ পোষণ করিতে স্ফুর করিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন সে দেখিল, ক্ষীণশ্রেতা একটি নদীর জলে কলার ভেলার উপরে, পরমাহন্দরী এক বালিকার মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে। সর্পদণ্ডনে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের নাকি দাহ করিতে নাই। স্বেচ্ছার জলে মৃতদেহ তাসাইয়া দেওয়াই নাকি বহুকালের প্রচলিত প্রথা। জহর কি আর করে, সাপুড়ে জাতির স্বদৰ্শ রক্ষা করিতে পিয়া, সে নদীর জল হইতে মৃতা বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া, মন্তব্লে তাহাকে পুনর্জীবিতা করিল।



জীবন দান করিল বটে কিন্তু, এই বালিকাটিকে লইয়া সে কি করিবে? কে যে তাহার আঙ্গীয়, কে তাহার স্বজন—কিছুই সে বলিতে পারে না। বিদেশে প্রকোপে তাহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জহর বড় বিপদে পড়িল। বেচারী নিরীহ, নিরাশ্রয়া মেয়েটি, নিরূপায়ের মতো কর্ম কাতর দৃষ্টি মেলিয়া জহরের দিকে তাকাইয়া থাকে। জহর তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে না, কেমন যেন দয়া হুর মেয়েটির উপর। দারুণ ঘৃণা দীরে দীরে মধুর মমতায় ঝুপান্তরিত হইয়া আসে। সেই শেষে আশ্রয় দিয়া ফেলিল এই মেয়েটিকে—অদৃষ্টের নির্ভুল পরিহাস হাড়া আর কি হইতে পারে! জহর তাহার সংস্কারবশে, বালিকার নারীবেশ একেবারেই সহ করিতে পারিল না। সে হির করিল, ইহাকে সে পুরুষের বেশে সাজাইয়া পুরুষের মতো মারুষ করিবে। সে তাহাকে একবরকম উগ্

ସାପୁଡ଼େ

ଉଦ୍‌ବନ୍ଧ ପାନ କରାଇଲ, ଯାହାତେ ଏହି ଉଦ୍‌ବନ୍ଧର ଶୁଣେ, ତାହାର ମଧ୍ୟେ ନାରୀ-ମୁଲକ କୋନୋ ଚେତନା ଜାଗାତ ନା ହୁଯା ।

ଜହର ତାହାର ନାମ ରାଖିଲ ଚନ୍ଦନ—ପୁରୁଷର ନାମ । କିଶୋରବେଶୀ ଚନ୍ଦନକେ ମନ୍ଦେ ଲାଇଯା ଜହର ଏହିବାର ଅନ୍ତ ଏକ ମାପୁଡ଼ିର ଦଲେ ଯୋଗଦାନ କରିଲ । ସେଇ ଦଲେର ବୃକ୍ଷ ମର୍ଦ୍ଦାର, ଜହରେର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ରବଳ ଦେଖିଯା ଏତ ଦେଶୀ ମୁକ୍ତ ହେଲ ଯେ ତାହାର ମୁହଁର ପୂର୍ବେ ଜହରକେ ଗେ ସେଇ ଦଲେର ମର୍ଦ୍ଦାର କରିଯା ଦିଯା ଗେଲ । କ୍ରମେ ଜହର ଏହି ଅର୍କିସଭ୍ୟ ଭବ୍ୟରେ ସାପୁଡ଼େର ଦଲେର ଏକଛତ୍ର ଅଧିପତି ହେଇଯା ଉଠିଲ ।

ଚନ୍ଦନ ଯେ ବାଲକ ନାହିଁ, ଦଲେର କେହିଁ ଦେ କଥା ଜାନେ ନା । ଜହରେର ଏକ ପ୍ରିୟତମ ଶିଶ୍ୱ ଝୁମରୋ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ମହିତର । ଚନ୍ଦନକେ ଝୁମରୋ ବଡ଼ ତାଲବାଣେ ।

ଏହି ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟ-ବ୍ରତଧାରୀ ଜହର, ନିରାନନ୍ଦଇଟି ବିଷଦର ମର୍ପଦଂଶ୍ନେର କଟୋର ପରିକ୍ଷାର ସଂଗୋବରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯା ଯଥିନ ତାହାର ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାନ୍ତୀମାଯ ଆସିଯା ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଁ, ତଥିନ ମହୀୟ ଏକ ସଚକିତ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଶିହରିଯା ଉଠିଯା ଗେ



ଅନୁଭବ କରିଲ ଯେ, ତାହାର ସଂଯମ-ମାଧ୍ୟମର ଉତ୍ସନ୍ନ ଶିଥର ହିତେ ବୋଧକରି ତାହାର ପଦସ୍ଥଳନ ହିତେ ବସିଯାଇଁ ।

ଦେଇନ ରାତ୍ରେ ଶୟନ କରିତେ ଯାଇବାର ପୂର୍ବେ ଅକଞ୍ଚାଏ ଏକ ତୀର ମଧ୍ୟ ବୈଦନାର ମତୋ ଚନ୍ଦନେର ରମଣୀୟ ସୁରମ୍ଭାର ରାପ-ମାଧୁରୀ, ତାହାର ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଆସିଯା ବୈଦିଲ ଏବଂ କ୍ଷଣିକେର ଜନ୍ମ ତାହାକେ ଉତ୍ତାଦ ଅହିର କରିଯା ତୁଳିଲ । ପ୍ରାଗପଣ ଚିତ୍ତସଂଘ୍ୟମେ ଦ୍ୱାରା କିଛୁକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ଦେ ତାହାର ଏହି ଶାମ୍ୟିକ ମୋହକେ ଅଭିକ୍ରମ କରିଲ । ଉତ୍ତାଦେର ମତୋ ଛୁଟିଯା ଗିଯା ଦେ ତାହାଦେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମନ୍ଦୀର ପଦପ୍ରାପ୍ତେ ବସିଯା ଶମ୍ଭୁ ରାତ୍ରି ଧରିଯା ବିନିଜ୍ ଚକ୍ର ଏହି ଅପରିସୀମ ଆତ୍ମମାନିର ଜନ୍ମ ଅନୁଭାବେ ଅଞ୍ଚମୋଟନ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଦେବୀ ପ୍ରତିମା କାହେ କ୍ଷତରିକ୍ଷତ ଅନ୍ତରେର ସକରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାଇଯା, ଦେ ପ୍ରାୟଶିକ୍ଷଣ କରିଲ ।

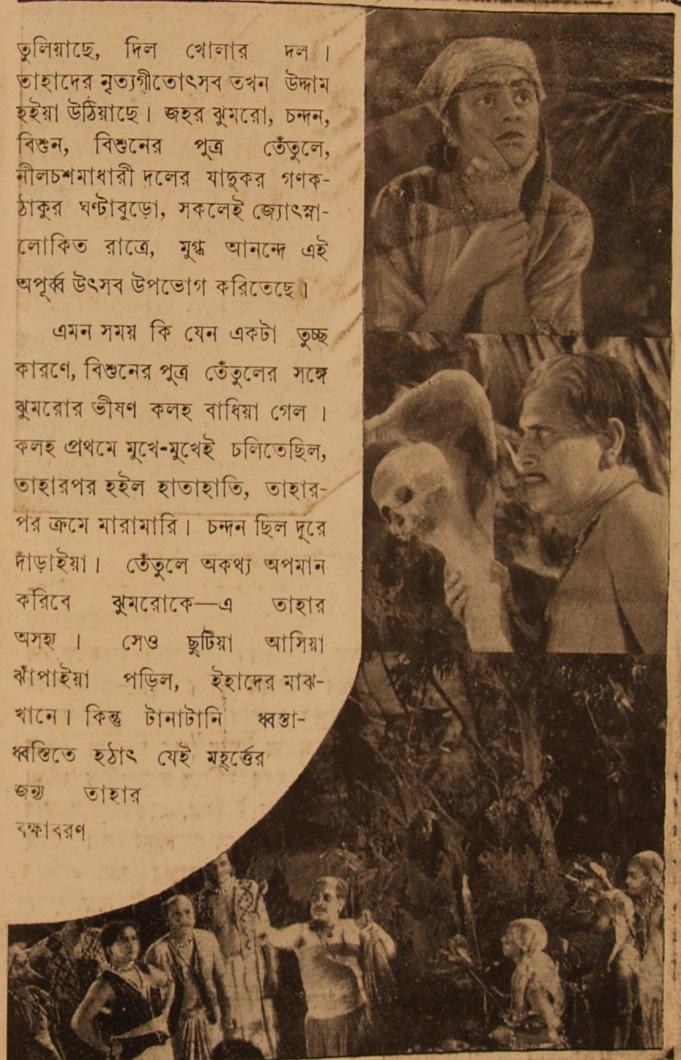


কিন্তু যে শুণ্টি কামনার আগুন
একবার জলিয়াছে, এত সহজে
কিছুতেই সে যেন নির্বাপিত হইতে
চাহিল না। ঠিক সেইদিনই খবর
পাওয়া গেল, বাজার সিপাহীরা
সাপুড়ের উপর বিষম অত্যাচার
মুক্ত করিয়াছে, কারণ দেশে নাকি
ভয়ানক ছেলেচুরি হইতেছে। সকলের
ধারণা সাপুড়েরাই এই কার্য
করিতেছে।

এই খবর পাইবানাত, জহর
সদলবলে তাহাদের ডেরা তুলিয়া, বহ
পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিজন,
ভীষণ, শাপদসঙ্কুল এক অবশ্যের
মাধ্যমে তাহাদের ঠাবু ফেলিল।
বন্ধ, হিংস্র জন্ম জানোয়ারের আক্রমণ
প্রতিরোধ করিবার জন্ম ঠাবুর
চারিদিকে আগুন জালিয়া
অনেকেই তখন ঘৃচুর শ্ফুর্তি
বরিতেছে। এই বিরাট
আমোদের মজলিম
জমাইয়া

তুলিয়াছে, দিল খেলার দল।
তাহাদের নৃত্যাশীতোৎসব তখন উদ্বাম
হইয়া উঠিয়াছে। জহর ঝুমরো, চন্দন,
বিশুন, বিশুনের প্তৰ তেঁতুলে,
মীলচশমাধারী দলের যাত্রকর গণক-
ঠাকুর ঘণ্টাবুড়ো, সকলেই জ্যোৎস্না-
লোকিত রাত্রে, মুক্ত আনন্দে এই
অপূর্ব উৎসব উপভোগ করিতেছে।

এমন সময় কি যেন একটা তুচ্ছ
কারণে, বিশুনের পুত্র তেঁতুলের সঙ্গে
ঝুমরোর ভীষণ কলহ বাধিয়া গেল।
কলহ প্রথমে মৃখে-মৃখেই চলিতেছিল,
তাহারপর হইল হাতাহাতি, তাহার-
পর ক্রমে মারামারি। চন্দন ছিল দূরে
দীড়াইয়া। তেঁতুলে অকথ্য অপমান
করিবে ঝুমরোকে—এ তাহার
অসহ। সেও ছুটিয়া আসিয়া
কাঁপাইয়া পড়িল, ইহাদের মাঝ-
খানে। কিন্তু টানাটানি খস্তা-
ধস্তিতে হঠাৎ যেই মহন্তের
জন্য তাহার
ব্যক্তাবরণ





ছিন্ন হইয়া গেল, দলের মধ্যে
বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া দেখিল—

চন্দন পুরুষ নয়—পুরুষের ছবিবেশে পরমাসুন্দরী এক তরুণী।

এই সময় কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আর একটি সুন্দরী তরুণী ধটনা-স্থলে আসিয়া দাঢ়াইল। তাহার নাম মৌটুনী। সে নিজের উত্তরীয়টি তাড়াতাড়ি খুলিয়া চন্দনের গায়ে জড়াইয়া দিল। কিশোর চন্দনকে, সে কুমারী-হন্দয়ের শীরের প্রেমের পূজাঞ্জলি নিয়ে দন করিয়াছিল—আজ যখন দেখিল, চন্দন তাহারই মত এক তরুণী, তখন তাহার লজ্জারণ প্রেম-স্বপ্নের প্রাপ্তাদ একেবারে ভাঙিয়া গেল। যে গভীর উদার প্রেম তাহার হন্দয়ে এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মধুর শথিতে ক্রপাস্তরিত হইয়া উঠিল। জহুর আসিয়া, লজ্জাবন্তমুখী চন্দনকে টানিয়া, একেবারে তাহার তাঁবুর ভিতরে লইয়া গেল। দলের শমস্ত লোক একেবারে অবাক। কেহ স্বপ্নেও কোন দিন কলনা করিতে পারে নাই—জহুরের মত একজন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী মন্ত্র-সাধক, এমন করিয়া এই সুন্দরী ঘূর্ণিষ্ঠিকে ঘৃক সাজাইয়া নিজের শঙ্গে রাখিয়াছে।

শুধু বিশ্বিত হইল না একজন—সে ধটাবুড়ো। এই বেদিয়ার দলে সে একটা অঙ্গু প্রকৃতির রহস্যময় মায়াবীর রূপে বাস করে। অনবরত মঞ্চপান করে, আর খড়ি পাতিয়া সকলের ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিন্তু সব কথা কথনে পরিকার করিয়া বলে না।

এই ব্যাপারে ঘটাবুড়ো, পরম বিজের মতো মাথা নাড়িয়া, মহসা এক অঙ্গুত কুর অট্টহাসি ছাসিয়া উঠিল।

এদিকে নিহতে, তাঁবুর এককোণে, পথর করিয়া কাপিতে কাপিতে জহুর ভীতা হরিণীর মতো চন্দনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে, “চন্দন, চন্দন, তুই আমার—একমাত্র আমার!”

তাহার এতদিনকার রূপ আস্ত্রসংযমের বীর্ধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—
দুর্কল্পাবী ব্যাক মতো সেই উন্মত্ত আবেগে, সেই হৃদিমণ্ডিয় দুর্বার বাসনা।
তাহাকে যেন অক করিয়া ফেলিয়াছে।

চন্দন বৃথাই নিজেকে প্রাণপণে তাহার আবিস্ফন্দ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টার পর চন্দন কিছুতেই যখন আর জহুরকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন সে তাহার শুষ্প বিবেককে জাগ্রত করিবার জন্য মিনতি কাতরকষ্টে জহুরকে স্বরূপ বরাইয়া দিল—তাহার মহাবৃত্তের কথা, তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, নাগ-মরুসাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা।





কথাগুলি জহরের বুকে গিয়া নিষ্ঠম মহাসত্যের মতো ধৰ্ক করিয়া বাজিল। সত্যই 'ত'! এ কি করিতেছে সে ! জহর যেন অক্ষৰাং তাহার সঙ্গে ফিরিয়া পাইল। মনসা-দেৱীৰ গ্রন্থিমার পালে সে এক অচৃত দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পৰ কিসেৰ যেন একটা অব্যক্ত মৰ্মযুগ্মণ্য কাতৰ হইয়া, তাৰু হইতে ছুটিয়া বাহিৰ হইয়া গেল। আজই—এই বাৰেই সে তাহার শততম সৰ্পদংশন পুৰুক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া, জীবনেৰ মহাবৰ্ত উদ্যাপন কৰিবে। আৱ বিলম্ব নয়।

বিষধৰ একটি সৰ্পেৰ শকান কৰিয়া, জহর যেমনই তাহার কৰ্ষ সিক কৰিতে যাইবে, অমনিই বিশুন কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংধান দিল—চন্দনকে লইয়া ঝুমৰো পলায়ন কৰিয়াছে। মৌচূলিৰ আগৰ এবং সাহায্যেই নাকি তাহারা এই দুঃসাহসেৰ কাজ কৰিয়াছে।

জহরেৰ বৰত আৱ সাঙ্গ কৰা হইল না। যে কঠোৰ সংযমেৰ বক্ষনে নিজেকে সে পুনৰ্বৰ পাথৰেৰ মতো স্তক নিৰ্বিকাৰ কৰিয়া তুলিয়াছিল, বিষনেৰ এই মৰ্মস্থিক সংবাদে প্ৰথৰ স্নোতেৰ মুখে বালিৰ বীাধেৰ মতো সে সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল। ক্রোধে, উমাদেৱ মতো অধীৰ হইয়া, জহর ছুটিয়া চলিল চন্দন-ঝুমৰোৰ শকানে। কিন্তু দলেৱ কেহই তাহাকে



তাহাদেৱ শকান দিতে পাৰিল না, তীব্র উত্তেজনায় সৰ্বশ্ৰদ্ধীৰে তখন তাহার যেন আগুন ধৰিয়া গেছে।

উন্নতেৰ মতো তাৰুতে প্ৰবেশ কৰিয়া, সে ঝাঁপি খুলিয়া বাহিৰ কৰিল,— বিষধৰ কালীয়নাগ ! সেই ভীষণ কালীয়নাগকে লইয়া, সে ছুটিয়া আসিল মহাকাল-মন্দিৰে—তাহার পৰ সেই কালীয়নাগকে মুৰপূত কৰিয়া ঝুমৰোৰ উদ্দেশে ছাড়িয়া দিল।

ঝুমৰো ও চন্দন তখন গভীৰ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া, গান গাহিতে গাহিতে নিৰক্ষেপেৰ পথে চলিয়াছে। দূৰে, বহুৰে চলিয়া গিয়া, তাহারা তুজনে একটি মধুৰ শুশেৰ নীড় রচনা কৰিয়া, পৰমানন্দে প্ৰেম-মধুযামিনী যাপন কৰিবে অনন্তকাল ধৰিয়া—মুদিত বিহুল চক্ৰ সন্ধুখে তখন তাহাদেৱ এই সুখ-সন্দেৱ মোহন মেহুৰ ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অপূৰ্ব আনন্দে বিভোৱ হইয়া, যখন তাহারা একেবাৰে আস্থাহারা হইয়া গেছে, তখন সহসা বিনামেষে বজ্জপাতেৰ মতো সেই মুৰপূত কালীয়নাগ আসিয়া ঝুমৰোকে দংশন কৰিয়া দিয়া, অদৃশ্য হইয়া গেল। বিষেৰ বিষম যন্ত্ৰণায় অস্থিৰ হইয়া, ঝুমৰো সেখানে বসিয়া পড়িল।



চন্দন একেবারে স্তুতি
নির্বাক ! নিঃসহায়, নিকৃপায়ের
মতো সে দাঢ়াইয়া রহিল। ঝুমরোকে বাঁচাইতে হইলে, এখন তাহার
আবার সেই জহরের কাছে গিয়া দাঢ়ানো ছাড়া আর উপায় নাই।

অবিরল অশ্বধারে চন্দন চোখে দেখিতে পাইতেছে না—সে চলিয়াছে
সেই পরিত্যক্ত ঠাবুর দিকে। কিন্তু কেমন করিয়া কোন মুখে সে আবার
জহরের কাছে গিয়া দাঢ়াইবে ?

জহর তখন নিশ্চল প্রস্তরের মতো বসিয়া আছে। অশ্বমূখী চন্দন
আসিয়া দাঢ়াইল তাহার কাছে। ঝানমুখে মৃদুকল্পিতকষ্টে সে কহিল,
ঝুমরো তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে যদি সে বাঁচাইয়া দেয় তাহা
হইলে ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে সে জহরের কাছে আস্ত্রবিক্রয় করিতেও
প্রস্তুত। জহর একটি কথাও বলিল না। স্পন্দাছন্নের মতো সে চলিল
চন্দনের পিছু পিছু। নীরবে সে গিয়া দাঢ়াইল ঝুমরোর বিষাক্ত নীলবর্ণ
মৃতদেহের পাশে।

ঝুমরো বাঁচিয়া উঠিল।

চন্দনের আনন্দের অবধি নাই। কিন্তু চন্দনের সময় নাই, সে
প্রতিজ্ঞাবদি—ঝুমরোর প্রাণের বিনিময়ে সে আস্ত্রবিক্রয় করিয়াছে জহরের
কাছে। এখন সে জহরের। ঝুমরোকে সে উভেজিত করণ, ভগ্নকষ্টে
বলে, “তুই দূরে চলে যা ঝুমরো, আমার চোখের স্মৃথে থাকিস নে—
আমি তোর নই”।

যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, একান্ত আপন, জীবন-সর্বিদ্ব, তাহাকে সে

চায় না। চন্দনের উদ্গত অঞ্চ আর বাধা মানে না। কঠরোধ হইয়া আসে।
অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদপিণ্ড যেন ছিড়িয়া যায়, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে।

অদূরে দাঢ়াইয়া, জহর এই করণ দৃশ্য দেখিতেছিল। যে কালীয়নাগ
মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিয়া ঝুমরোকে বিয়ুক্ত করিয়াছে, সে তখনও তাহার
হাতে।

জহর একবার অচুত দৃষ্টিতে চন্দনের দিকে তাকাইল, একবার তাকাইল
ঝুমরোর দিকে—একবার মনে-মনে কি যেন তাবিল।

অকস্মাৎ সে নির্বিকার তাবে সেই কালীয়নাগের দংশন নিজের বুক
পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ঝুমরো চীৎকার করিয়া কহিল, “ওস্তাদ কি করলি !”

চন্দন ও ঝুমরো হজনেই ছুটিয়া জহরের কাছে গেল। জহর তুক্ককষ্টে
বলিয়া উঠিল, “ঝুমরো শীগ্ৰীর একে নিরে চলে যা আমার স্মৃথ
থেকে—আমি বিষ জহম করবো, এই আমার শেষ সাপ—তারপর আমি
মন্ত্র পড়বো। মেয়েমাহ্নয়ের শামনে মন্ত্র নষ্ট হয়। ওকে এখান থেকে
নিয়ে যা—এ জপল থেকে, এ দেশ থেকে নিয়ে যা”।

চন্দন আর ঝুমরো অগত্যা চলিয়া গেল। ওস্তাদ দেখিল তাহারা দূরে
চলিয়া গেছে, কিন্তু নাগমন্ত্র আর সে উচ্চারণ করিল না। খিতহাস্তে
আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, “মন্ত্র, ও সাপের মন্ত্র আর নয়—এইবার
আমার মন্ত্র—‘শিব-শঙ্কু—শিব-শঙ্কু’ !

কালীয়নাগের বিষে তাহার সর্বশীরী জমশঃ নীল হইয়া আসিতে লাগিল,
চোখ ছাইটি স্তুমিত নিষেকে হইয়া গেল ; কিন্তু তাহার সমস্ত মুখের উপরে
মনে হইল, কিসের যেন এক অপার্থিব আনন্দের ভাস্ফুর দীপ্তি প্রতিফলিত
হইয়াছে, তাহার বিশ্বক আস্ত্রার সমস্ত বিক্ষেত্রে যেন শাস্ত হইয়া গিয়াছে,
জীবনব্যাপী মর্ম্মযন্ত্রণার যেন অবসান হইয়াছে।

সর্বশেষ সর্পের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-সাধনায় পরিনামে সে সিদ্ধকাম হইল কি ?

সঙ্গীতাংশ



—এক—

হলুদ-গীদার ফুল,
রাঙা পলাশ ফুল,
এনে দে, এনে দে, নৈলে রাধব না বাধব, না চুল,
কুস্মী রং শাঢ়ী চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে,
এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল।
নৈলে রাধব না, বাধব না চুল॥

কুস্তুম পাহাড়ে, শাল-বনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকেল বেলায়।
দলে দলে পথে চলে সকাল হ'তে
বেদে-বেদেনী নপুর বেধে পায়।
যেতে দে ঐ পথে বাশী শুনে শুনে পরাগ বাউল॥

নৈলে রাধব না বাধব না চুল॥

—কোরাস

একুশ

—চতুর্থ—

আকাশে ছেলান দিয়ে
পাহাড় ঘূমায় ছঁ
ঁ পাহাড়ের বর্ণা আমি ঘরে নাহি রই গো
উদ্বাও হয়ে বই॥

চিতা বাধ মিতা আমার,
গোঁথুৰো খেলার সাথী,
সাপের ঝাঁপি বুকে ধরে
রুথে কঠাই রাতি।
বৃণু হাওয়ার উডনী ঘরে নাচি তাঁধে ধৈ॥

—কারন

—তিনি—

কলার মান্দাম্ বানিয়ে দাও গো,
শশুর সঙ্গাগর,
ঁ মান্দামে চড়ে যাবে বেটলা লক্ষ্মনুর,
কলার মান্দাম॥

ওলো কুল-বালা, নে এই পলার মালা,
বর তোর ভেঁড়া হ'য়ে রইবে মালার ভয়ে
ও বৌ পাবি নে, জীবনে সতীন জালা॥

আমরা বেদেনী গো পাহাড় দেশের বেদেনী।
গলার ধ্যাণ, পায়ের পেদ, পিঠের কুজ,
বের করি দাতের পোকা, কানের পুঁজ ;
ওষধ জানিলো, হোঁকা স্বামীর
কোঁকা খায় যে কামিনী॥

পেঁকি পাওয়া মিনসে গো
ভুতে ধরা বউ গো।
কালিয়া পেরেত মামদো ভুত
শ'ক-চুরি হামদো পুত
পালিয়ে যাবে, বেদের কবচ লও গো॥

বাশের কুলো, বেতের ঝাঁপি, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও ওগো বৌ, হবে খোকা খুকি॥

সাপুড়ে

নাচ, নাচ, নাচ—বেদের নাচ ? সাপের নাচ ?
গোলেমাণী পাথর মেবে ? রান্ধীন কাচ ?

—কোরাস্

দেখি লো তোর হাত দেখি।
হাতে ছবু-গুন্ধ, এলি রঁধতে রঁধতে কি ?
মনের মতন বর পেলে, নয় কহা ছয় ছেলে।
চিকন আঙ্গুল দীঘল হাত, দালান-বাড়ী ঘরে ভাত,
হাতে কাকল পায়ে বৈকী।

ও বাবা ! এ কোন ছুঁড়ি ? সাত নন্দ তিন খাঙড়ি।
ভুবে ভুবে খাছ জল, কার সাথে তোর পিয়াত বল।
চোখের জলে পারবি তারে বাধতে কি ?
দেখি লো তোর হাত দেখি।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে



—চার—

(কথা) কইবে না কণা বইবে না বৌ,
তোর সাথে তার আড়ি আড়ি—আড়ি।
(বৌ) মান করেছে, যাবে চলে আজই বাপের বাড়ী ॥
বৌ কসনে কথা ক'সনে,
এত অন্নে অধীর হ'স নে,
ও নতুন ফুলের খবর পেলে
পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
ওর মন্দ প্রভাব ভারি ॥

—কানন

—পাঁচ—

মৌটুকী— পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
হিজল ফুলের মালা ।

কি করি এ মালা নিয়ে বল টিকণ-কালা ॥

চন্দন— নই আমি সে বনের কিশোর,
(তোর) ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর,

বন জানে আর মন জানে লো, আমাৰ বুকেৰ জালা ॥

বনারো— ঘি-ঘট-মউ আম-কাঠালেৰ পিডিখানি আন,
বনেৰ মেয়ে বন-দেবতায় কৰবে মালা দান

লতা-পাতাৰ বায়ুৱ-ঘৰে

রাখ ওৱে ভাই বন্ধু কৰে,

ভুলিসনে ওৱ চাতুৰীতে, ওলো বনবালা ॥

—মেনকা, কুনন, পাহাড়ী ।

—ছয়—

ফুটুকুটে ঝি চাঁদ হামেৰে
ফুল-ফুটানো হাপি ।
হিয়াৰ কাছে পিয়ায় ধৰে
বলতে পাৰি আজ যেন রে

তোমায় নিয়া পিয়া আমি

হইব উদাসী ॥

—পাহাড়ী ও কানন

সাপুড়ে



—সাত—

আমাৰ এই পাত্ৰখানি
ভৱে না শুধায় জানি,
আমি তাই বিদেৱ পিয়াসী।
চেয়েছি চান্দেৱ আলো,
পেয়েছি আধাৰ কালো,
মনে হয় এইতো ভাল,
ভাল এই কাটাৰ জাল।
চাহিনা ফুলেৱ মালা—ফুলেৱ হাসি
আমি তাই বিদেৱ পিয়াসী ॥ *

—কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে

* এই গান খানিৰ রচয়িতা : অজয় ভট্টাচার্য। বাকীগুলিৰ রচয়িতা : কাজী নজীফুল

